ঢাকা বুধবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১, ১১ আশ্বিন ১৪০৮, বর্ষ ৩ সংখ্যা ৩১৫

প্রথম আলো

## সম্পাদকীয়

# সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা

### নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলবে

নির্বাচন সামনে রেখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর হামলা, নির্যাতন ও ভয়ভীতি দেখানোর উদ্বেগজনক খবর পাওয়া যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে। প্রতিদিনই এখন পত্রপত্রিকায় ছাপা হচ্ছে এ ধরনের নানা অপতৎপরতার খবর। সংখ্যালঘুদের ভোট নিজেদের পক্ষে নিতে অথবা তাদের ভোট যাতে প্রতিপক্ষ দলের পক্ষে না যায় সে জন্যই চলছে এ ধরনের হুমকি-ধামকি আর নির্যাতনের ঘটনা; যা সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং প্রশ্ন উঠবে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। এ পরিস্থিতি কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।

আমাদের পত্রিকার খবর অনুযায়ী পাবনা, বাগেরহাট, ভোলা, সাভার, চট্টগ্রামের রাউজান ও রাঙ্গুনিয়াসহ মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, পিরোজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী ও চাঁদপুর এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। কোথাও কোথাও তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর, আগুন লাগানো, লুটপাট এমনকি নারী নির্যাতনের মতো ঘটনারও অভিযোগ পাওয়া গেছে। আমরা সবসময়ই দেখে আসছি যে, নির্বাচন এলে এ ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি পায়। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজেদের ভোটব্যাংক মনে করা বা প্রতিপক্ষ বিবেচনা করার যে নোংরা রাজনীতি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো করে আসছে তারই অসহায় শিকার হচ্ছেন সংখ্যালঘুরা।

আমরা সংখ্যালঘুদের নিয়ে এ ধরনের ঘৃণ্য রাজনীতির বিরোধী। দেশের নাগরিক হিসেবে যেকোনো দল বা প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়ার অধিকার তাদের আছে। তারা তাদের অধিকার প্রয়োগে বাধাগ্রস্ত হলে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাই প্রশ্নের মুখোমুখি হবে।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তার প্রতিকার দাবি করেছে। পাশাপাশি এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কেও তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পরামর্শ দিয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল এ ব্যাপারে তাদের উদ্বেগের কথা রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমরা আশা করব যে এটা নিছক আশ্বাস না হয়ে বাস্তবেও এর প্রতিফলন দেখা যাবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের জানমাল রক্ষা ও কোনো ধরনের হুমকি-নির্যাতন ছাড়াই যাতে সংখ্যালঘুরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। আমরা মনে করি, তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব।

# নারায়ণগঞ্জে অস্ত্র উদ্ধার

### প্রার্থীদের মঙ্গলার্থে ক্যাডার পরিত্যাজ্য

নির্বাচনের মাত্র সাত দিন আগে নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের একটি নির্বাচনী গাড়ি বহরের দুটি গাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ দল তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করে। অস্ত্রের মধ্যে ছিল পিস্তল, রিভলভার, কিছু গুলি ও একটি মেটাল ডিটেক্টর। ছাত্রলীগের দুজন ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ সব দল শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কথা বলছে। এ সময় নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের গাড়ি বহরে অস্ত্রবহন এক গুরুতর অপরাধ। অস্ত্রের সঙ্গে মুখোশও ছিল। তাহলে কি পরিচয় গোপন রেখে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যার উদ্দেশ্যেই ওইসব অস্ত্র ব্যবহার করা হতো?

প্রতিদিনই নির্বাচনী সহিংসতা ঘটছে। নির্বিচারে অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেক এলাকায় অভিযোগ উঠেছে যে অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না বা তাদের গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও সেনাসদস্যদের যৌথ টিম প্রশংসনীয় তৎপরতা চালিয়েছে। শুধু অস্ত্র উদ্ধার নয়, অস্ত্রধারী অপরাধীদের গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী শামীম ওসমান দলের একজন প্রভাবশালী নেতা। তার নির্বাচনী গাড়ি বহরে অবৈধ অস্ত্রধারী ক্যাডার কেন থাকবে। এ ঘটনা শামীম ওসমানের নিজের নির্বাচনী অবস্থানকে যেমন প্রশ্নসাপেক্ষ করেছে, তেমনি তার দলের অবস্থানকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

তাহলে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও অবৈধ অস্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের ঘোষিত অঙ্গীকারের কী মূল্য থাকল? এসব ভালো ভালো কথা কি শুধুই ইশতেহারে লেখার বিষয়? আর গাড়ি বহরে থাকবে সব সশস্ত্র মাস্তান?

এটা দুঃখজনক যে, আওয়ামী লীগসহ প্রায় সব দলই নির্বাচনকে সামনে রেখে অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। আর মুখে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কথা বলছে। দোষারোপ করছে প্রতিপক্ষকে। আমরা বলব, প্রত্যেক প্রার্থীর রাজনৈতিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। এ জন্য সশস্ত্র ক্যাডার পরিহার করতে হবে। প্রার্থীদের মঙ্গলের জন্যই স্বউদ্যোগে এ ব্যবস্থা করা দরকার।

# তাঁরা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাই পাল্টে দিলেন

**এবিএম মূসা**

আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করে সেই অধিকারটি সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলাম। সেই পদ্ধতিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যা কিন্তু বাস্তবে অগণতান্ত্রিক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিত্বহীন একটি সরকার বা ব্যবস্থাকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক বলা যায় না। তবুও এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে কারণ জনগণের প্রতিনিধিগণই এই ব্যবস্থাটি প্রস্তাবনা ও গ্রহণ করেছেন। যেহেতু পদ্ধতিটি সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে ও একটি সংসদে সর্বসম্মতক্রমে তা সংশোধনীর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে সে কারণে পদ্ধতিটিকে গণতন্ত্রের সিল দেওয়া যায়। কেউ কেউ বেয়াড়া প্রশ্ন করতে পারেন : দুটি সামরিক শাসনকেও সংসদ বৈধ করেছে তা বলে কি সেই পদ্ধতিও সঠিক ছিল বলতে হবে?

এসবই শুধু তর্কের খাতিরে তর্ক, আসল কথা হলো বিশ্বাসে মিলায় সবই তর্কে বহুদূর। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম (১) দেশে একটি বিশ্বাস্য, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা ব্যবস্থা থাকতে হবে। (২) এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে অবিশ্বাস করেছি। (৩) আমাদের প্রথম বিশ্বাসকে কার্যে পরিণত করার জন্য অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের হাতে স্বল্পসময়ের জন্য দেশের সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছি। এই বিশ্বাসগুলোর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে একটি সরকার গঠনের মাধ্যমে। প্রসঙ্গত, সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেননি। সংবিধানে এই ধরনের কোনো সুযোগ ছিল না। তিনি একটি ঐকমত্যের সরকার প্রধান হয়েছিলেন। তবে তাঁকে স্বৈরাচারী জেনারেল এরশাদই নিয়োগ দিয়েছিলেন অথবা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর একটি ঐকমত্যের সরকারের পূর্ণাঙ্গ রূপটি দিয়েছিলেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আলোচনা ও আমার বক্তব্য বোঝানোর জন্যই পুরনো ইতিহাস নতুন করে ঘাঁটতে হচ্ছে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন প্রধান উপদেষ্টা নয়, রাষ্ট্রপতি ছিলেন। সত্যিকার অর্থে উপপ্রধান রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করায় তিনি ভারপ্রাপ্ত হলেন। এমতাবস্থায় তাঁর একটি মন্ত্রিসভা থাকার কথা ছিল, উপদেষ্টা পরিষদ নয়। এসবই পরে সংসদে হালাল করে নিতে হয়েছে। এমনকি তার প্রধান বিচারপতি পদ থেকে আসা ও ফিরে যাওয়ার জন্যও সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। বাস্তবে একানব্বইয়ের নির্বাচন পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল না। ঐকমত্যের সরকারে বিচারপতি সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দশজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। উপদেষ্টার সংখ্যা আরো বেশি হতে পারত। সংখ্যাটি সম্পূর্ণভাবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ইচ্ছায় নির্ধারিত হয়েছে। অবশ্য সবার সঙ্গে আলোচনা করেই এই কাজটি তিনি করেছেন।

উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি ও সংখ্যা এখন আলোচনায় আসছে। এই কারণেই ঐকমত্যের সাহাবুদ্দীন সরকারের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছি। সাহাবুদ্দীন সাহেব যাঁদের উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন তাঁরা যে নির্দলীয় ছিলেন না তা পরবর্তী সময়েই বোঝা গেছে। তাঁর উপদেষ্টাদের বেশ কয়েকজন পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে এসেছেন ও কেউ কেউ বিশেষ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন। বলা যায়, তাঁর সরকার ছিল দ্বিদলীয়, মানে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের নির্বাচিতদের তিনি উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন। আজকে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুচারজন উপদেষ্টা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, তখন এই উদাহরণটি মনে রাখা প্রয়োজন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন তাঁর বিচারালয়ের পরিধির বাইরে কাউকে চিনতেন না, তাই সবার মত নিয়েছেন, পরামর্শ অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব ভারসাম্য রক্ষা করে উপদেষ্টাদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাঁর নিয়োজিত উপদেষ্টাগণ আর যাই করুন দায়িত্ব পালনকালে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। অথবা বলা যায়, এমন কোনো কাজ করেননি বা বক্তব্য দেননি যা তাদের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করত। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানকে সংশোধিত সংবিধান ৫৮(গ-৮) এই বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে বলেছে, 'রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগদান করিবেন।' বিধানটি যদি উল্টো হতো, পরামর্শদানের কাজটি যদি রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনের ওপর ন্যস্ত থাকত তা হলে আজকে আমার এই নিবন্ধটি লেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কার্যকারণ সম্পর্কও খুঁজতে হতো না।

সংবিধান অনুসরণ করে সত্যিকার অর্থে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেছিলেন বিচারপতি হাবিবুর রহমান। সেই সরকারটি যেভাবে পরিচালিত হয়েছে, তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব তাঁরা মেটিকুলাসলি তথা খুঁটিনাটি সকল কর্তব্য সতর্কতার সঙ্গে পালন করেছেন এখন সেভাবে বর্তমান সরকারের কার্যক্রম পালিত হচ্ছে কিনা তা কাউকে ব্যাখ্যা করতে জানাতে হবে না। অবস্থা এমন যে তুলনামূলক আলোচনাও করা যাচ্ছে না। কারণ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিজস্ব নিয়মনীতি ও ইচ্ছা-অনিচ্ছামাফিক চলছেন। অতীতের তত্ত্বাবধায়কদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সুলুক-সন্ধান করতে হয়নি, এখন তাঁদের নিজেদেরই সংবাদ সম্মেলন করে, পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে, মুখপাত্রের মাধ্যমে কৈফিয়ত ও ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে। কাউকে কাউকে বারবার বলতে হচ্ছে, 'দোহাই আপনাদের, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিতর্কিত করবেন না।' অন্যেরা বলছেন, 'নিজেরা বিতর্কিত হবেন না অথবা প্রথম থেকেই বিতর্কিত হওয়ার মতো কাজকর্ম করবেন না।' এ কাজটি তারা এমনি এমনি করছেন, অথবা একটি কাজ করে তা সামাল দেওয়ার জন্য অনেক কথা বলতে হচ্ছে কেন? অথচ বিচারপতি লতিফুর রহমানের পূর্বসূরিদের বা তাঁদের উপদেষ্টাদের এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

যাঁরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিতর্কিত করা, অথবা তাঁদের নিজেদের বিতর্কিত করা নিয়ে ক্ষুব্ধ, তাঁদের সরকারে অবস্থানকারীদের কতিপয় বক্তব্য নিয়ে ভাবতে বলছি। এক. তাদের দুএকজন বলছেন, কে কী ভাবল তাতে যায় আসে না। এই 'কেয়ার লেস', কারো ধার-ধারি না মনোভাবটি স্বেচ্ছাচারী ধ্যান-ধারণার পরিচায়ক; দুই. তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলেছেন, সবাইকে খুশি করা যায় না। অতীব সত্যিকথা, লাখো কথার এক কথা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল গৃহীত পদক্ষেপে যদি সবাই খুশি হতেন তবে খুবই ভালো হতো। সবাই যদি নাখোশ হতেন তা হলেও বলতাম এমনটি হতে পারে। কিন্তু যখন দেখা বা বোঝা যায়, একটি পক্ষই শুধু খুশি হচ্ছে আর অন্যপক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করছে তখন এমনটি নিরপেক্ষতার পরিচায়ক কিনা সেই প্রশ্নটি করতেই হবে। ভাবতে হচ্ছে, যারা বলেছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা মানি না তাঁরা বলছেন, কী সুন্দরভাবে প্রক্রিয়াটি কার্যকর করা হয়েছে। যাঁরা এই প্রক্রিয়াটি চালু করার জন্য সংগ্রাম করেছেন, এমনকি রক্ত দিয়েছেন তাঁদের মনে আজকে সমগ্র ধারণাটি সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এমনটি হওয়ার কারণ হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি তাড়াহুড়ো করে চালু করার কারণে এর মাঝে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে। বিএনপির দুদিনের সরকারটি যে সংশোধনী করে গেলেন তা পরিপূর্ণ ছিল না। ফাঁকগুলো এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান কে হবেন তা বলা হলো কিন্তু উপদেষ্টাবর্গ নিয়োগের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন এমন একজন ব্যক্তির হাতে যার আদালত ভবনের বাইরে সবাইকে ভালো করে জানার বা চেনার সুযোগ নেই। ইতিপূর্বে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শ নিয়েছিলেন। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সামাজিক গণ্ডি ছিল বিস্তৃত, চেনাজানা ছিল প্রায় সকল মহলের সঙ্গে। তাই সঠিক উপদেষ্টা নিয়োগ নিয়ে তার কোনো সমস্যা হয়নি। এই দুইজনের উপদেষ্টাদের কার্যকলাপ ও দায়িত্ব পালন নিয়েও তাই কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। সংবিধানে নির্দলীয় সরকারের কথা বলা হয়েছে অথচ যাঁরা এই সরকারে উপদেষ্টা হবেন তাঁদেরও যে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হতে হবে, অন্তত নিরপেক্ষতার একটি আচ্ছাদন থাকা দরকার তা সংবিধানে বলা হয়নি।

২. দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোনো নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। নীতি-নির্ধারণী বলতে কী বোঝায় বা নীতি-নির্ধারণী কার্যাবলির সীমানা কতদূর তা যতদূর সম্ভব ব্যাখ্যা করে দেওয়া উচিত ছিল। বিষয়টি এত ফ্লেক্সিবল বা নমনীয়, ধোঁয়াটে ও অস্বচ্ছ হওয়াতে তত্ত্বাবধায়কদের দু-চারজনের কাজের পরিধি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। কেয়ারটেকার মানে বাড়ির দেখভাল করবেন, তিনি স্বল্প সময়ের তত্ত্বাবধায়ক থাকাকালে বাড়ির দরজা-জানালাসহ সব বদলিয়ে ফেলতে পারেন না, এমনটি সংবিধানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত করা উচিত ছিল। অবশ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রণেতা অথবা প্রবক্তাগণ তখন অনুমানও করতে পারেননি এমন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসতে পারে যাঁরা নিজেদের মালিক বলে ঠাওরাবেন।

৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা মাত্র। কেয়ারটেকার শুধু বাড়িঘর পরিষ্কার রাখবেন, প্রয়োজনে বাগানের আগাছা সাফ করবেন। বাড়ির মালিকের পছন্দমাফিক পুরাতন বা নতুন ভাড়াটিয়া এলে বাড়িটি বুঝিয়ে দেবেন। ইতোমধ্যে আগের ভাড়াটিয়ার লাগানো গাছের কলমগুলোও উপড়ে ফেলবেন এমনটি কেউ ভাবে না। এই কারণে কেয়ারটেকার দুই সরকারের মাঝামাঝি সময়টি কীভাবে কাটাবেন তা সংবিধানে আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হওয়া প্রয়োজন। তারা যে শুধু দেখভালের দায়িত্ব পেয়েছেন, যা কিছু করার পাওয়ার অর অ্যাটর্নি বা আম-মোক্তারনামা দেওয়া হয়নি তা আরো প্রাঞ্জল ভাষায় সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

৪. সংবিধানের ৫৮-গ-৯-১০ উপচ্ছেদ দুটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ নেই। তা না হলে এবার হয়তো হবে না, ভবিষ্যতে আরো একটি সংকট দেখা দিতে পারে। এই দুই উপচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদত্যাগ ও পদে অনুপযুক্ততার কথা বলা আছে। যদি এমনি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি বলেন আর পারছি না, 'সব ছেড়েছুড়ে চললাম' তা হলে কী হবে? আবার নতুন করে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সময় বা সুযোগ নাও থাকতে পারে। দলীয় কোনো ব্যাখ্যাকারীর মতে, সে ক্ষেত্রে যিনি বা যাঁরা তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন তাঁরাই আবার বহাল হবেন। এই ধরনের ব্যাখ্যা অদ্ভুত জটিলতা ও সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

এসব কারণেই বলছিলাম, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। অন্তত বর্তমানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে বিতর্কের সূচনা করেছেন সে কারণেই পদ্ধতিটিকে কার্যকর করার জন্য আরো চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেভাবে চলেছিল বা বিচারপতি হাবিবুর রহমান যেভাবে সরকার চালিয়েছিলেন সেভাবে যদি বিচারপতি লতিফুর রহমান ও তাঁর কতিপয় উপদেষ্টা চলতেন বা চালাতেন তা হলে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার লুপহোল বা ফাঁক-ফোকরগুলো চোখে পড়ত না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কেউ কোনো বিতর্কিত পদক্ষেপ নিয়ে সেই ফোঁকর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতেন না। যতই বিতর্কিত হোন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এই একটি মাত্র কারণে ধন্যবাদ জানানো উচিত। সেই ফাঁকফোকরগুলো আমাদের নজরে আনতে পেরেছেন, আমাদের সবকিছুই ট্রায়াল অ্যান্ড এরর, ভুলভ্রান্তি করা ও শোধরানোর মাধ্যমেই সকল পদ্ধতিকে বাস্তবসম্মত করতে হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করা সম্ভব নয় অন্তত যে পর্যন্ত বিকল্প খুঁজে পাওয়া না যাবে সেই পর্যন্ত নয়। যেনতেনভাবে বর্তমান পরিস্থিতিটি পার করে দিয়ে ভবিষ্যতে প্রক্রিয়াটিকে প্রয়োজনীয় সংশোধন-সম্মার্জন ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে হবে। ধারণাটিকে আরো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করতে হবে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তত্ত্বাবধায়কদের করণীয় কাজের সীমানা কঠোরভাবে নির্ধারিত করে দিতে হবে। কনসেপ্ট বা ধারণাটি বর্জন নয়, ঢেলে সাজাতে হবে।

**এবিএম মূসা : সাংবাদিক ও কলাম লেখক।**

# ‘অবিচারই সন্ত্রাসের মূল কারণ’-কোন সন্ত্রাস?

## সৈয়দ আমীরুল ইসলাম

সুবিখ্যাত পণ্ডিত-গবেষক-লেখক এডওয়ার্ড সাঈদের ‘অবিচারই সন্ত্রাসের মূল কারণ’ লেখাটি পড়লাম। ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত নিবন্ধটি প্রথম আলো ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ বুধবার ৮ পৃষ্ঠায় ‘আক্রান্ত আমেরিকা’ কলামে প্রকাশ করে ধন্যবাদার্হ হয়েছে, নইলে এটি চোখে পড়ার কথা ছিল না। এডওয়ার্ড সাঈদ একজন প্রথিতযশা পণ্ডিত, বিশেষ করে তার গ্রন্থ ওরিয়েন্টালিজমের জন্য সারা বিশ্বে নন্দিত। নন্দিত হওয়ার মতো ব্যক্তিত্বই বটে। তিনি লেখালেখিতে ভিন্নতর মত এবং পথনির্দেশে। কিন্তু উল্লিখিত রচনাটি আমাকে বিস্মিত করে তুলেছে এ কারণে যে, তার মতো এত বড় একজন পণ্ডিতের দৃষ্টিতে ওসামা বিন লাদেন (‘বিন লাদেন’ তার আসল নাম নয়, বিন লাদেন অর্থ লাদেনের পুত্র বা লাদেনপুত্র, মূল নাম ওসামা)-এর সন্ত্রাস আর অন্যতর প্রেক্ষাপটের সন্ত্রাস, যেমন-দেশোদ্ধারে সন্ত্রাস-যথা দক্ষিণ আফ্রিকার এএনসির এক সময়ের সন্ত্রাস (যে উদাহরণ সাঈদ দিয়েছেন) যে কোনোক্রমেই এক ধরনের নয় এবং এক ব্র্যাকেটে উদাহরণ হিসেবে আসতে পারে না, এ কথা সাঈদ ঠিক বুঝতে পারেননি, বলতেও দ্বিধা লাগে। মহত্তর একটি কার্যসিদ্ধির জন্য যখন সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়, তখন সেখানে নৈতিক একটি সমর্থন এসে যেতে পারে এবং সেখানে ‘অবিচারই সন্ত্রাসের মূল কারণ’ কথাটি মানতে খুব একটা দ্বিধা হয় না, যদিও সেখানেও মতদ্বৈধতা থাকতে পারে। কিন্তু ওসামা বিন লাদেনের মতো মানুষ যখন বর্তমান কালকে শত শত বছর পেছনের দিকে ঠেলে দিতে চান সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে, তখন তা কি কোনো সুস্থ আধুনিক মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে? অথচ সাঈদের লেখাটি কিন্তু ঠিক সে কাজটিই করেছে; মনে হয়েছে ওসামার সন্ত্রাসও ‘অবিচার’ থেকেই উৎসারিত এবং এর ফলে পরোক্ষভাবে যেন তাকেও সমর্থন করার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আসলে কি তাই বলতে চেয়েছেন এডওয়ার্ড সাঈদ? মনে হয় না। তার মূল ইংরেজি নিবন্ধের শিরোনাম কী ছিল জানি না। যদি অনুবাদ যা করা হয়েছে তা হয়ে থাকলে এবং অভ্যন্তরের অনুবাদ যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হবে সাঈদের মতো মানুষও ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেছেন অথচ একজন ফিলিস্তিনি হিসেবে নিজের সদর্থক ভাবটিকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন নঞর্থক সন্ত্রাসবাদের ওপর। বড়মাপের মানুষও ভুল করে।

আমরা, দক্ষিণ এশিয়ার মানুষরা, যারা বিগত শতকে অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ দেখেছি, অনেকে অংশগ্রহণও করেছি। এখনও এমন কেউ কেউ জীবিত আছেন, যারা সেসব কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন, এখনো তাদের নাম যথেষ্ট সম্মানসহকারে উচ্চারিত হয়, শহীদ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। সেই ক্ষুদিরাম থেকে সূর্য সেনের কথা বলতে গেলে গর্বে মন ভরে ওঠে। তারা ছিলেন পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য জীবন উৎসর্গকারী একদল মহান মানুষ এবং স্বাধীনতার প্রাপ্তিতে তাদের অবদান খাটো করেও দেখা হয় না-হোক না মত বা পথ ভিন্ন। কিন্তু এই আমরাই বিগত এক দশক ধরে যে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং বর্তমানে বসবাস করছি, তা কখনোই সমর্থন করতে পারি না বলেই নির্বাচনের এক বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্ত্রাস নির্মূল করার আহ্বান। দুই সন্ত্রাস নিঃসন্দেহে এক নয়! সাঈদ এ দেশে জন্মালে বোধকরি দুই সন্ত্রাসের তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে পারতেন। কিন্তু তারপরও কথা এই যে, সাঈদ তো অন্তত বর্তমান আফগানিস্তানের অবস্থাটা দেখতে পারছেন-সেখানে যে ঘটনা ওসামা ঘটিয়েছেন, তা কতটুকু দেশ ও দশের স্বার্থে আর কতটুকু ‘অসৎ কিসের জন্য’ তা বোঝা খুব কঠিন নয়! যে ওসামাকে যুক্তরাষ্ট্র লালিত পালিত করে এত বড় করেছে বলে শোনা যায়, আজ সেই তাদের একেবারে ঘরে গিয়ে আঘাত করেছে-এ তার সহ্য করার বিষয় নয় ঠিকই, কিন্তু আবার তাই বলে যেভাবে সেখানে হৈচৈ শুরু হয়েছে তাকে নিয়ে, সেও মনে হচ্ছে মশা মারার জন্য কামান দাগার মতোই। অবশ্যই নিরীহ জনগণের ওপর এমন বর্বরোচিত এবং কাপুরুষজনিত আক্রমণের নিন্দা প্রকাশ করার ভাষা নেই। কিন্তু তাই বলে আবার ক্ষুদ্র এক সন্ত্রাসকে নিঃশেষ করার জন্য বৃহৎ সাধারণ জনগোষ্ঠীকে বিপদে ফেলাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নিশ্চয়ই ওসামা এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকার সামান্যতম ক্ষতি করতে পারেননি-এক চমক সৃষ্টি ছাড়া। কিন্তু ক্ষতি করেছেন প্রচুর-মুসলমানদের এবং ইসলাম ধর্মের। আর সাঈদের নিবন্ধটির মূল বক্তব্য সেখানেই : ইসলাম এবং মুসলমানকে ‘ওকসিডেন্ট’ যে দৃষ্টিতে অর্থাৎ নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে চায়, তারই প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু এখানেও তিনি আবার ভুলে গেছেন যে, মুসলমান ওসামা বিন লাদেনের মতো মানুষই তো সে সুযোগ করে দিচ্ছেন! ইসলামের সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের সুমহান বাণী এক পাশে ফেলে রেখে কাফের-মুশরেক আর নাসারার মতো শব্দাবলি সমানে সামনে এনে ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ আর ইবনে খালদুনের গায়ে কালিমা লেপন করছেন। ফলে মুসলমান মানেই টুপি বা পাগড়ি আর দাড়িসর্বস্ব এক অদ্ভুত জীব বলে প্রতিভাত হচ্ছে সারা দুনিয়ায়! অথচ ওসামার কী না ছিল? বায়ান্ন সন্তানের মধ্যে সতেরতম হিসেবে যে ৩০ কোটি ডলার (যা শোনা যায়) দিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে কয়েকটি দেশের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারতেন সিরাতুল মুসতাকিমের পথেই, সন্ত্রাসবাদে না গিয়ে। আজ যেখানে গেছেন সেখানে সারা দুনিয়ার ৬০০ কোটি মানুষের মধ্যে তিনি এক ভয়ানক মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছেন-তার মাত্র গুটিকয় অন্ধ ভক্ত ছাড়া, যারাও এক সময় ছেড়ে যেতে বাধ্য। সিনেমায় তো এসব কিসসা হরদমই দেখা যায়। সাঈদ এত সহজ এবং সস্তা চিন্তা করেন না। আর সে জন্য ওসামার সন্ত্রাসের মূল কারণ খুঁজে বেড়ান।

অতি অবশ্যই ধনবাদের প্রতিভূ-রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র বা এ ধরনের দেশগুলো শোষণ, শাসন সবই করছে এবং এখন এককেন্দ্রিক বিশ্বে তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ‘একম-অদ্বিতীয়ম’, তার প্রকাশও মাঝে মাঝে ঘটছে। যেমন টুইন টাওয়ার, পেন্টাগন ইত্যাদি আক্রমণের পরে সে যেন ‘ডিকটেট’ করছে সারা বিশ্ব রাষ্ট্রগুলোকে ‘হয় আমার দিকে থাক নয় শত্রুর দিকে’। কিন্তু শত্রু যে কে তা কিন্তু এখনো সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত হয়নি এবং সে জন্য কেউ কেউ এ নিয়ে কথাবার্তাও বলছে, তবে খুব শক্তভাবে প্রতিবাদও করতে পারছে না। কারণ ঘটনাটা ঘটেছে খুবই মর্মান্তিক এবং অমানবিকভাবে, যা ওসামা নিজেও তার কাঁধে তুলে নেননি, যদিও সমর্থন করেন তার বিশেষ দৃষ্টিতে। আর এজন্যই সব অপরাধের ভার যেন এসে পড়েছে ইসলাম এবং মুসলমানদের ওপর। এদিকটা ওসামা বা যারা এ কাজ করেছে তারা ভেবেছিল কিনা কে জানে! অথবা ভাবলেও ভেবেছে, কি আর করা যাবে, কিছুটা দোষ তো পড়বেই। কিন্তু এটা কি ভেবেছিল যে ওই দু-চারটে বিল্ডিং ভাঙলেই কি ধনবাদ ভেস্তে যাবে এবং এসে পড়বে অতীতের সোনালি দিন, যা এক অলীক কল্পনা? আসলে যে সন্ত্রাসবাদে ইতিবাচক কোনো দিক নেই, তা শুধু মানুষের ক্ষতিই করে, তা যতই ‘অবিচার’ থেকে উঠে আসুক, কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। ইরাক, প্যালেস্টাইন কিংবা সারা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার নানা হট্টগোল-অভাব-অভিযোগ অথবা সব মুসলমানের দুঃখ কি সন্ত্রাসবাদ দিয়ে মেটানো যাবে, নাকি যে অভিধায় আজ অভিহিত হচ্ছে এর চেয়ে বেশি কিছু হবে? ‘অবিচার’ যতই হোক, এর প্রতিকার কখনোই আর এক ‘অবিচার’ (গুপ্ত-আঘাতের মাধ্যমে) দিয়ে সম্ভব নয়, বরং সচেতন জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। দুনিয়ার সব মানুষের মধ্যে সহজ ‘বুঝ’ একের জন্য অন্যের প্রতি কর্তব্যবোধ সৃষ্টির মধ্য দিয়েই অন্যায়ের প্রতিবিধান হতে পারে, অন্য কোনোভাবে নয়। সাঈদের কথাও বোধহয় এই-ই।

**সৈয়দ আমীরুল ইসলাম : লেখক, ইতিহাসবিদ।**

# বোমাকীর্ণ পথে নির্বাচন

## আব্দুল কাইয়ুম

এবারের নির্বাচন কুসুমাস্তীর্ণ নয় সবাই জানে কিন্তু সেটা যে এমন বোমাকীর্ণ তা কে জানত! বাগের-হাটে আওয়ামী লীগ প্রার্থী শেখ হেলালের নির্বাচনী জনসভায় আবার রহস্যজনক বোমা বিস্ফোরণে আটজন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়েছেন। এখানে ‘আবার’ এবং ‘রহস্যজনক’ শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ অতীতে যশোরে উদীচীর সম্মেলন থেকে শুরু করে রমনা বটমূলে এবং এরপর নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা বিস্ফোরণের ধারাবাহিকতায়ই এ বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা যায়। একই প্যাটার্ন। লক্ষণীয় যে, এসব বোমা বিস্ফোরণের যারা ভিকটিম তাদের প্রায় সবারই অবস্থান একটি অভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। এরা সবাই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে। অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে। মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক অথবা অন্তত প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে। দল হিসেবে আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট পার্টি আক্রান্ত হয়েছে। এদের ভাবাদর্শগত পার্থক্য অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও বিগত প্রায় চার-পাঁচ দশকের রাজনীতিতে এদের দলীয় নৈকট্য অনস্বীকার্য। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায়, গত প্রায় দুবছর ধরে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণে টার্গেট হয়েছে একটি পক্ষ। অপর পক্ষ অর্থাৎ বিএনপি, জামায়াত, মুসলিম লীগ, আমিনী গোষ্ঠী কিন্তু এ ধরনের বিশেষ বোমা বিস্ফোরণের শিকার হয়নি। এই ধারাবাহিকতায় বিবেচনা করলে এ ধরনের বোমা বিস্ফোরণ রহস্যজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

কেউ কেউ বলেন, নারায়ণগঞ্জে শামীম ওসমানের অনেক শত্রু। শেখ হেলালের অনেক শত্রু। সে কারণেই তাদের বিরুদ্ধে বোমা-অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। এ ধরনের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনার তাৎক্ষণিক কারণ বা উপলক্ষ হতে পারে। কিন্তু শত্রুতা থাকলেই কি কেউ রিমোট কন্ট্রোলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সভা-সমাবেশে আগত নিরীহ লোকজনকে হত্যা করার অধিকার পায়? এটা তো হয় না। মানুষ খুনের অধিকার কারোর নেই। শেখ হেলালের জনসভায় বোমা বিস্ফোরণ নিছক কোনো নির্বাচনী সংঘর্ষ বলে বিবেচনা করা যায় না। কারণ ও ধরনের সংঘর্ষের কিছু পরিচিত লক্ষণ থাকে। কোথাও দুই দলের মারমুখী মিছিলে সংঘর্ষ হয় বা স্লোগান-পাল্টা স্লোগানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় অথবা কোনো এক দলের কর্মীরা অন্য দলের নির্বাচনী ক্যাম্প ভাঙচুর করে বা পোস্টার-ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে। তখন সংঘর্ষ হতে পারে। সেখানে বড়জোর বোমা ছুড়ে মারা হয়। কে কাকে লক্ষ করে বোমা মারছে সেটা শনাক্ত করা যায়। কেন সংঘর্ষ তারও একটা কারণ বোঝা যায়। কিন্তু বাগেরহাটে শেখ হেলালের সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় সে ধরনের কোনো পরিচিত লক্ষণ নেই। নির্বাচনী সংঘর্ষের জন্য টাইম বোমা পুঁতে রাখার প্রয়োজন পড়ে না।

বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী সংঘর্ষে এ পর্যন্ত শতাধিক লোক নিহত হয়েছে। ব্যাপারটা যদি এরকম হতো যে, সেই নিহতদের তালিকায় বাগেরহাটের বোমা বিস্ফোরণে নিহত আরো আটজন যুক্ত হলো তাহলে হয়তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিছুটা স্বস্তিবোধ করতেন এই ভেবে যে, যাহা বায়ান্ন তাহা তেপ্পান্ন! শখানেক লাশ বহন করে যদি সুষ্ঠু নির্বাচন করা যায় তাহলে ১০৭টি লাশ নিয়ে কেন নির্বাচন করা যাবে না। কথা তো ঠিক। কিন্তু এই শেষ সাতটা লাশ কি আগের শখানেক লাশের মতোই ব্যাপার? নাকি অন্য কোনো ব্যাপার আছে?

বাগেরহাটে যে ধরনের বোমা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো বিশেষ প্রযুক্তির। এ বোমা ব্যবহারের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ লাগে। দেশী প্রযুক্তির গতানুগতিক বোমা নয়। সাধারণ নির্বাচনী সহিংসতার সুযোগে যদি অন্য কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে এই আধুনিক প্রযুক্তির বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়ে থাকে তাহলে নির্বাচনের আগেই আরো দু-একটি অর্থবহ নির্বাচনী সমাবেশে এ ধরনের রহস্যজনক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হতে পারে। বাগেরহাট হয়তো তাদের টেস্ট কেইস। হয়তো আরো বড় কোনো ট্র্যাজেডি অপেক্ষা করছে? কে জানে? বাগেরহাটের ঘটনাটি সে কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ-ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য। সাধারণ নির্বাচনী খুনোখুনির মতো এ ঘটনার দায়দায়িত্ব শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চাপিয়ে বসে থাকলে ভুল হবে।

অনেকে বলেন, লাশের জন্য রাজনীতিবিদরাই দায়ী। সেটা ঠিক। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে মরণ খেলায় মত্ত হয়েছে। একজন একটা খুন করলে আরেকজন দশটা খুনের বদলা নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আবার আরেকজন হয়তো ঘোষণা না দিয়েই দশ-বিশটা রাজনীতিক খুন অনায়াসে করে চলেছেন। তাই রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলগুলো এসব খুনোখুনির জন্য অনেকাংশে দায়ী।

কিন্তু এত খুনোখুনি তো ১৯৯১ বা ১৯৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় হয়নি। এখন হচ্ছে কেন? এটা ভেবে দেখার বিষয়। পূর্বের তুলনায় এবারের নির্বাচনে রাজনীতির অঙ্গনে অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদের সঞ্চয় বেশি-এরকম একটা যুক্তি দেওয়া চলে। আরো বলা চলে যে, এবার রাজনীতিতে হিংসা, হানাহানি পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু এসব যুক্তি যদি সত্য হয় তাহলে এ সত্যও মেনে নিতে হবে যে, বিরাজমান বাস্তবতায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যত বেশি মনোযোগী, উদ্যোগী ও তৎপর হতে হতো ততটা তারা হননি। আওয়ামী লীগের কৃতী গডফাদার জয়নাল হাজারীকে নির্বাচনী ময়দান থেকে ‘আউট’ করতে গিয়ে বিএনপির আরেক কৃতী গডফাদার ভিপি জয়নালের ‘ইন’ করার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক পক্ষের কাছে নন্দিত ও আরেক পক্ষের কাছে নিন্দিত হয়েছেন। এরকম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে হয়তো ‘অপারেশন ফেনী’ মডেলটি অন্যান্য এলাকায় পরিচালিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে দেশের অন্যান্য এলাকায় সন্ত্রাসীদের তৎপরতা দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে। সেই সুবাদে ফেনীতেও নির্বাচনী সংঘাত, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চলছে নির্বিবাদে।

নির্বাচনের সময় সহিংস ঘটনা বিচিত্র নয়। কিন্তু এসব ঘটনা সব সময় একটি যুক্তিগ্রাহ্য সীমার মধ্যে থাকে। এবার সংঘাত, খুনোখুনি সীমা ছাড়িয়ে গেল কেন তা খুঁজে দেখা দরকার। বাগেরহাটের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি একদিকে চলতি নির্বাচনী হানাহানি এবং অন্যদিকে সমাজ ও রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়োজিত অপশক্তির তৎপরতার সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি পরিকল্পিত ব্যাপার বলে ধারণা করা ভুল হবে না। সে জন্য এ ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা প্রশ্ন করব, সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কী করছে? একটি ঘোষিত জনসভাস্থলে টাইম বোমা ফিট করা সাধারণ কথা নয়। যদি ইনটেলিজেন্স কাজ না করে তাহলে তো প্রতিদিন যে বড় বড় নির্বাচনী সভা-সমাবেশ হচ্ছে তাদের কোনোটিরই নিরাপত্তা নেই। আর সেক্ষেত্রে ১ অক্টোবরের নির্বাচনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার খোলামেলা অভিযোগ যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপির পক্ষাবলম্বন করছে। অন্যদিকে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন, ‘আজ থেকে দেশের কোথাও বিএনপি কর্মীরা আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হলে তার জন্য রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকেই জবাব দিতে হবে।’ তিনি অভিযোগ করছেন যে, নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। বড় দুটি দল যদি খুশি মনে আস্থার সঙ্গে নির্বাচন করার ভরসা না পায় তাহলে অস্থিতিশীলতার শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই।

সময় শেষ। নির্বাচন সমাগত। এই শেষ মুহূর্তেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি কিছু ভাবতে চান তাহলে এদিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। একটি সার্বিক আস্থার পরিবেশে নির্বাচন করলে বোমা বা অন্যান্য সহিংসতার প্রকোপ অনেকাংশে কমিয়ে আনা যাবে।

**আব্দুল কাইয়ুম : সাংবাদিক।**

### অভিমত

# জন্মদোষ ভোটরোষ নন্দঘোষ

## রণজিৎ বিশ্বাস

বিষয়টা সবসময় মনের মধ্যে থাকে, ভোট এলে বেড়ে যায়। ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে যায়, ভয়াবহভাবে বেড়ে যায়। কে কেমন লিখছে, কে কতটুকু লিখছে, কে কেমন বলছে-দেখার জন্য, পড়ার জন্য পত্রিকার পাতায় চোখ রাখতে রাখতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে হয়ে, কিন্তু খুব একটা চোখে পড়ে না, যতটুকু চোখে পড়লে আদতে কিছু হোক না হোক একধরনের স্বস্তি পাওয়া যায়, আশ্বাসের ক্ষণস্থায়ী সুবাস পাওয়া যায়, ততটুকুও দেখা যায় না।

বিষয়টা কী? বড় স্পর্শকাতর বিষয়, বড় তপ্ত বিষয়, বড় শীতল বিষয়, বড় ভয়ের বিষয়, বড় এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়, বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং বড় প্রয়োজনীয় বিষয়। সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়। আরো ভালো করে বললে, সবাই মিলে যুদ্ধ করে চিলের ঠোঁট থেকে নিয়ে আসা স্বাধীন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়। ভোটের অধিকার তাদের আছে, উর্দিপরা দুজন মানুষ একের পায়ের ছাপে অন্যে পা রেখে বিনা প্রয়োজনে দেশের একাট্টা মানুষকে দোফালা করে গেলেও নির্বাচনে ভোট দিয়ে, ব্যালট পেপারে বিবেচনামতো সিলছাপ্পড় মেরে নিজেদের প্রতিনিধি **চুনে** নেওয়ার অধিকার এখনো তাদের সংবিধানস্বীকৃত। তবু, ভোট দেওয়ার সময় এলে নির্বিঘ্নে তারা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। তাদের বিবেচনা করতে হয় ভোটের চেয়ে জীবন বড়, নিজের জীবনের চেয়ে সন্তানের জীবন বড়, পরিবারের নিরাপত্তা বড়।

বেশি দূরের অতীত নয়, ৩০ বছর, বাংলাদেশে এই ভয়ের বয়স ৩০ বছর। এ ভয় বাংলাদেশের জন্মসঙ্গী বলা ভালো; ভ্রূণসঙ্গী বলা আরো ভালো, আরো শুদ্ধ আরো সহি।

সত্তরের নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তানে ৯৮ শতাংশ যারা পেল, তারা মানুষের জোয়ারের জোরে পেয়েছে, তার পরও মোটামাথা পাকিস্তানি ও তাদের **পাশবেতর** নেটিভ পদলেহীরা অন্যরকম বিশ্বাসে ও ধারণায় বিশেষ জন্মপরিচয়ের সংখ্যালঘু কিছু মানুষের ওপর বিশেষভাবে চড়াও হলো। ইতিহাস সাক্ষী, অন্তরের সত্য সাক্ষী, তাদের ওপর ছোবল বেশি পড়ল, বিষ বেশি ঢালা হলো। যেন ওরাই সব কটা সিট পূর্বপাকিস্তানে একটা পার্টিকে দিয়ে দিয়েছে। এই গলদ মানুষগুলো জেরবা’র করা অবস্থায় এই পবিত্র মাটি, ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই উদার জমিন রেখে একসময় পালিয়ে গেল। কিন্তু রেখে গেল কিছু নাজায়েজ আওলাদ। তারা দেশে ভোটের সময় এলে বারবার ফুঁসেফুঁসে ওঠে, বারবার হিস্‌হিস্‌ করে। চেনা বাড়িগুলোতে গিয়ে বলে যাসনে তোরা ভোট দিতে যাসনে, না গেলেই পেয়ে যাব তোদের ভোট। বলে জানের ভয় থাকলে সেন্টারে যাবি না, বলে-যাস যদি, ভোটের পরে টের পাবি। ভোটের পরে, যারা তাদের ভোট পায় না, তারা হেরেও তাদের টের পাওয়ায়, জিতেও। হারার পর বলে-ভোট কেন দিসনি; জেতার পর বলে-তোরা দিলে তো আরো বেশি ভোট পেতাম। এক অদ্ভুত জন্মভাগ্য। একদল তাদের সুখ-অসুখ ব্যথা-বেদনা দেখে না, ‘দায়ের তলার মাছ’ মনে করে। ভাবে-যাওয়ার জায়গা যখন নেই, আমাদের সঙ্গেই ওদের থাকতে হবে; মারি, কাটি, সম্পত্তি লুটি আর যাই করি ওদের ভোট অন্যদিকে যাবে না; ওদের ভোট মানে আমাদের ব্যাংকের টাকা। আরেক দল, কলজে কেটেও যদি ওরা বলে-এবার ভোটটা রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে-শোকে ওদের দিইনি তোদের দিয়েছি, বিশ্বাস করে না।

তখন ওদের করার উপায় একটিই। পিঠের ওপরে ছাপ যখন একটা জন্মদোষে পড়েই গেছে, সেই ছাপ নিয়েই তারা থাকে। এতে যাদের লাভ, তারা আবার ঘাট পেরুবার পর বলে-তোদের দু’পা এক জায়গায় নেই কেন? এক অসামান্য চমৎকার জন্মভাগ্য নিয়ে ওরা সংসারে আসছে, বড় হচ্ছে, হতাশায় কাতরাচ্ছে এবং একদিন মরে যাচ্ছে; কখনো কখনো মারা যাচ্ছে তাদের বেনিফিশিয়ারিদের হাতেও। কোথাও কোথাও দায়িত্ব পালনের সীমিত সুযোগ যে গুটিকের জুটছে, তাদের নিরপেক্ষতার অন্য নাম স্বগোত্রের প্রতি পক্ষপাত। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

যারা বলে-জানের ভয় থাকলে ভোট দিবি না, তারা ভাবে এভাবেই জেতা সম্ভব, এভাবেই ওদের নিঃশেষ করে দেওয়া সম্ভব, অন্য কোনো চিন্তা তারা মাথাতেই আনে না অথবা এমনও হতে পারে-মাথার খোঁপে তাদের জায়গাই নেই, একধরনের ল্যাতল্যাতে পদার্থ সেখানে বড় বেশি। যারা তাদের কান্নার জোরে বেদনার জোরে ও ঝুঁকির জোরে হাসে এবং যারা রুচিহীনভাবে বলে-কেন তোদের দেখতে পাই দু’পায়ের ভিন্ন ঠাঁই, তারাও বোঝার চেষ্টা করে না ওদের হতাশা, বেদনা ও বঞ্চনার বোঝাটা কত ওজনের।

যতদিন এমন অবস্থা থাকবে ততদিন সাম্প্রদায়িক, ছদ্ম সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, রাজাকার ও

রাজাকারের চেয়ে ভয়ঙ্কর মুক্তিযোদ্ধারা প্রচার করতে থাকবে-এবারের যুদ্ধ অমুকে-তমুকে নয়, এই পোশাকে আর সেই পোশাকে, ধর্ম যদি বাঁচাতে চাও ওই বাহন থেকে নেমে যাও; হাটে-বাজারে আড্ডায়-দোকানে তাদের ক্যাসেট বাজতে থাকবে; ছদ্মাধুনিক কোনো বামপন্থী মুখে বলবে, অসাম্প্রদায়িকতার কথা আর ভোট জিতে আসবে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে প্রচার চালিয়ে তারপর সংসদে দাঁড়িয়ে ভোট দেবে রাজাকারকে স্পিকার বানানোর জন্য। এমন হয়েছে এ দেশে। বড় সফেদ ও শুচিশুদ্ধ অনেক মানুষের বেলায় হয়েছে।

পত্রিকায় খবর এসে বড় বেশি ভাবিয়ে দিচ্ছে চট্টগ্রাম ৬-৭ আসনে, রাঙ্গুনীয়-রাউজানে দুই প্রার্থী মানুষের ঘুম হারাম করে ফেলেছে, বরিশালে-খুলনায় ধর্মব্যবসায়ীরা বলে চলেছে-বেছে নাও ধুতি কিংবা টুপি; রূপসা-তেরখাদায় বলা হচ্ছে-যাকে বলি তাকে যদি ভোট না দিস ফাটিয়ে ফেলব; বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জের হোগলাপাশা, রামচন্দ্রপুর; পিরোজপুরের সদর ও নাজিরপুরে, ওই এলাকার রেখাখালি গ্রামে মিস্ত্রিবাড়ি ও বিশ্বাসবাড়িতে হামলার খবর পত্রিকায়, যত সংক্ষিপ্ত অবয়বেই হোক, এসে গেছে। মানুষ পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছে। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে, মাগুরার নড়াইলে, যশোরের আটটি উপজেলার চারটিতে, নড়াইলের সদর, লোহাগড়া ও কালিয়াতে, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়ায় রাউজানে (রাঙ্গুনীয়ায় সংখ্যালঘু ভোটার ৫০ হাজার, রাউজানে ৬৫ হাজার। '৯১ ও ৯৬-এর নির্বাচন এদের ৯০ শতাংশ ভোট দিতে পারেনি। কী জানি চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কেউ এ লেখা পড়ছেন কি না। যদি পড়েন, তারা যেন ভাবেন-রাঙ্গুনীয়ায় আর রাউজানে কী করা যায়।) ফেনীর দাগনভূঞার বৈরাগীবাজারে, কুড়িগ্রাম শহরের একটি বিশেষ পাড়ায়, চাঁদপুরের কচুয়ায় এবং দেশের ৩৭টি জেলার ৯০টি আসনে যে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি-সন্ত্রাসের জোরে প্রায় ১ কোটি ভোটারকে মানবেতর কিছু প্রাণী ভয়ের ঘোরে ফেলে দিয়েছে; তাদের হাত-পা কেউ ভেঙে না দিক অকার্যকর তো অন্তত করা যায়। যাদের ওপর ভরসা এবং ভরসা নিয়ে যাদের নামানো হয়েছে, তারা কি এ কাজের জন্য দুর্বল ও অসমর্থ? মন বলে-মোটেই নয়। তারা কি পরিস্থিতির গুরুত্বটা বুঝবে? তারা কি যা তাদের করার কথা তা করার জন্য জানহাজির থাকবে? মন বলে-কী জানি!

মনের প্রার্থনা-নানা বাস্তব কারণে প্রায় কোটি মানুষের মনে তৈরি হওয়া হতাশাজর্জর এই অবস্থাটা যেন দূর হয়ে যায়। যাদের তা দূর করার কথা, তারা যেন তা করতে পারে, করার সময় তারা যেন ইবাদতের প্রেরণায় প্রাণিত থাকে।

যাদের সরাসরি করার কিছু নেই, প্রার্থনাই তাদের অবলম্বন। এ প্রার্থনা ঊর্ধ্বলোকে শোনার জন্য কেউ বসে নেই, মর্ত্যলোকে বিভিন্ন জায়গায় বসা 'কী-পয়েন্ট'-এর মানুষগুলো যেন অন্তত শোনে। শুনে যেন বুঝতে পারে, বুঝতে পেরে যেন সচল হয়, সচল অবস্থায় যেন আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান থাকে, নিষ্ঠাবান থাকা যেন পবিত্র দায়িত্ব মনে করে এবং দায়িত্বে বিচ্যুতিকে যেন অপরাধ জ্ঞান করে।

শেষ কথা : যদিও এই কথাটি সবার শেষে এখানে বলা হচ্ছে, তা দিয়ে তার শুরুও হতে পারত। যে শব্দটি শুধু কমিউনিকেশন বা সহজ যোগাযোগের কারণে ব্যবহার করা হয়েছে অজস্রবার, 'সংখ্যালঘু', তা পরিহার করতে পারলে ভালো হতো। কারণ আমাদের দেশে 'সংখ্যালঘু' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (কনোটেশান) ভালো নয়। তা কিছু লোক ব্যবহার করে কিছু সংখ্যালঘু মানুষকে অপমান ও করুণা করার জন্য। (শিরোনামে শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে ওই বোধ থেকেই, যদিও ইচ্ছে করছিল লেখার ওপর 'ভোটের সময় সংখ্যালঘুদের কালসময়' জাতীয় কিছু লেখার ওপর বসানোর জন্য)। এই কদর্থে-যারা ব্যবহার করে, তারা জানে না চূড়ান্ত সংখ্যালঘু বলতে কিছু নেই। হেন বিষয় নেই, যে কারণে মানুষ সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু হতে পারে না। এও আমাদের মনে থাকে না-কোনো একস্থানে কোনো এক বিচারে যারা সংখ্যাগুরু, আরেক স্থানে বা আরেক বিচারে তারাই আবার সংখ্যালঘু। আমাদের আরো মনে থাকে না-সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু মিলিয়েই মানুষের বাগান এবং এক ফুলে বাগান সুন্দর হয় না, চাষ হলে হতে পারে।

**রণজিৎ বিশ্বাস : কথাসাহিত্যিক।**